সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী ও ভারতে ওহাবী আন্দোলন

by Nobojagaran June 15, 2020 in ভারতবর্ষের ইতিহাস 0

sayed ahmed Saheed,

Share on Facebook Share on Twitter

লিখেছেনঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত বুযুর্গ, আমাদের তথা কওম ও মিল্লাতের গৌরব সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) ভারতের **ওহাবী আন্দোলনের** প্রাণপুরুষ। তিনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী ১২০১ হিজরীর মুহাররম মাসে উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসূত্রে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর বংশধর । তিনি **শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর** পূত্র শাহ আব্দুল কাদিরের আধ্যাত্মিক শিষ্য। সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এতটাই স্বদেশভক্ত ও কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় পান নি। তাঁর দৈহিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ছোটবেলা থেকেই তিনি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলতেন। পরে তিনি যোগ দিলেন ‘এক ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুর সেনাবাহিনীতে; শিখলেন সামরিক রণকৌশল। এর সঙ্গে অন্যদের সাহায্য করার

বিনিময়ে শিখলেন প্রশাসনিক কাজকর্ম।' কিন্তু ঐ সামন্তপ্রভূ ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে তিনি ঘৃণাভরে চাকরি থেকে ইস্তেফা দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এই সময় ভারতবর্ষের দুর্দশা দেখে তিনি মর্মাহত হন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন,

> "তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসী মুসলমানদের অন্তর হইতে ইসলামের মূল আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কয়েক শতাব্দী কাল পৌত্তলিক হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার দরুন মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং আচার আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড সমূহে বহুল পরিমাণে শেরেক বেদআত প্রবেশ করিয়াছে । ইসলামের আদর্শ এবং শিক্ষা ও সৌন্দর্য যে পৌত্তলিকতার মালিন্য দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তিনি বিশেষ রুপে অনুভব করিয়া উহা সংস্কারের জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ।" (Indian Musalman, অনুবাদ-মাওলানা আহমদ আলী)

সেইজন্য সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৪ বছর বয়সে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। যখন সৈয়দ আহমদ শহীদ দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে অবস্থান করছিলেন তখন শায়খুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মূরীদ হন। যদিও তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর থেকে বয়স ও জ্ঞানবুদ্ধির দিক থেকে অগ্রণী ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাই শামসুল উলামা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর বিশিষ্ট ছাত্র ও জামাতা ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে এবং প্রেরণায় হযরত **আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবীও** সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং মূরীদ হন। আর শাহ ইসমাইল শহীদও বয়স ও জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকেসৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর অগ্রণী ছিলেন। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর ভাইপো শাহ ইসমাইল শহীদকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও এঁরা সৈয়দ আহমদ শহীদকেই আধ্যাত্মিক গুরু তথা মুর্শিদ রুপে গ্রহণ করেছিলেন। দেওবন্দীদের শায়খুল মাশায়েখ হাজি আব্দুর রহীম বেলায়তী (রহঃ) বিরাট রুহানী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের কাছে আত্মসমর্পন করে তাঁরা কাছে মুরীদ হন এবং নিজ মুরীদ নুর মুহাম্মাদ ঝানঝনাভীকেও দীক্ষিত করেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা তাঁর ভক্তদেরকে মুগ্ধ করেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতায় আসেন এবং তাঁকে সকলেই অত্যান্ত সম্মানের সাথে সংম্বর্ধনা করেন। বাংলার কয়েক হাজার মুসলিম নরনারী তাঁর হাতে মুরীদ হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নেন। এই প্রসঙ্গে ইউলিয়াম হান্টার লিখেছেন,

> "In Calcutta the masses flacked to him (to sayyed Ahmad) in such a number, that he was unable even to go through the ceremony of invitation by the Separate laying on hands. Unrolling his turban, there force, he declared that all who could touch any part of its ample length, become his disciples." (The Indian musalman)

সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর সব থেকে উল্লেখযোগ্য মুরীদ ছিলেন হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ)। তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী ১২ই রবিউস সানী, ১১৯৩ হিজরী সনে উত্তর প্রদেশের মুযাফফার নগর জেলার ফুলাতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ আব্দুল গণী দেহলবী (রহঃ) এবং পিতামহ ছিলেন মুসলিম জাহানের বিখ্যাত চিন্তাবিদ মুহাদ্দিসে আজীম, ওলীয়ে কামিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)। শাহ ওয়ালীউল্লাহর চার পুত্রের মধ্যে অপর তিনজনের

নাম যথাক্রনে, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ), শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এবং শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)। নতুন দিল্লীর 'মেহদীয়ান' এলাকায় এখনও তাঁদের মাযার বর্তমান রয়েছে। শাহ ইসমাইল শহীদের মাতার নাম ফাতেমা এবং মাতামহের নাম হযরত মাওলানা আলাউদ্দিন ফুলাতী (রহঃ)।

শাহ ইসমাইল শহীদ মাত্র আট বছর বয়সে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয (মুখস্ত) করেন এবং অতি অল্প বয়সে কুরআন পাকের মানে মতলবও শিখে নেন। তিনি দুই তিন বছরে আরবী ব্যাকরণের নুহু-সরফ (Syntax & Elymology) আয়ত্ব করেন। তিনি ছয় সাত বছর বয়সে জ্যাতির্বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি বিষয়েও অধ্যয়ন করেন।

তাঁর পিতা শাহ আব্দুল গণী যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর । (১২ই এপ্রিল ১৭৭৯)। ইন্নালিল্লাহি ……… । এর পর তাঁর ভরণ-পোষনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর চাচা শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)। তিনি এবং শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলবী ভাইপো ইসমাইলকে জ্ঞান অর্জনের জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তিনি বারো বছর বয়সে যুক্তি বিজ্ঞানের জটিল গ্রন্থ 'সদরা' পড়তে আরম্ভ করেন এবং আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র, ফিকাহ, যুক্তিবিজ্ঞান, হিকমত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে চাচা আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে থাকেন। মাত্র ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তৎকালীন দিকপাল উলামারা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি জানান।

মিঁয়া রহীম বক্সের নিকট অশ্বারোহনেও পারদর্শিতা লাভ করেন, দুর্দান্ত অশ্বের পৃষ্টে সহজেই উঠে, 'ছুট কাটাতে' পারতেন, আবার ইচ্ছামত সহজেই নেমে যেতে পারতেন এর জন্য পাদানী বা জিনপোষের প্রয়োজনই হত না। বিভিন্ন অস্ত্র চালনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বন্দুকের গুলি ছোঁড়ায় খুব সুন্দর নিশানা লাগাতে পারতেন। কুস্তি পড়তে পারতেন। খুব সুন্দর সাঁতার কাটতে পারতেন। দিল্লীর 'সিদরাতুল মসজিদ' এলাকা থেকে জমুনার খরস্রোতে সাঁতার দিয়ে আগ্রার তাজমহল পৌঁছে যেতেন, আবার সাঁতার কেটে দিল্লী শহরে চলে আসতেন। প্রচণ্ড রোদে জামে মসজিদের উত্তপ্ত চত্তরে দীর্ঘ সময় পায়চারী করতেন। ভয়ঙ্কর হাড় কাঁপানো শীতে সাধারণ কাপড়-চোপড় পরে পরে ঘুরে বেড়াতেন। অল্প আহার, অল্প নিদ্রার তাঁর অভ্যাস ছিল। এসব আশ্চর্যজনক অভ্যাসের একটাই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মুজাহিদসুলভ ক্রিয়াকর্ম, জনসেবা ও আত্মত্যাগ। তাঁর বুযুর্গী ও নিষ্ঠা মানুষকে মুগ্ধ করেছে। শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলবীর কন্যা জয়নবের সাথে শাহ রফিউদ্দিন দেহলবীর পুত্র আব্দুর রহমান ওরফে মুস্তাফার শুভ বিবাহ হয়। এঁদের কন্যা কুলসুমের সাথে শাহ ইসমাইল দেহলবীর শুভ বিবাহ হয়। এই বিবাহ দেন শাহ শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী। অর্থাৎ শাহ শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী ভাইপো ইসমাইলকে নাতজামাই করেন। শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবী ভাইপো ইসমাইলকে এতই স্নেহ করতেন যে, তিনি স্বগর্বে কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করতেন আর বলতেন, "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন।" এখানে শাহ ইসহাক দেহলবী ছিলেন শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবীর নাতি।

বর্ণিত আছে, শাহ ইসমাইল শহীদ-এর যুগে দিল্লীর কুখ্যাত বাঈজী 'মোতির' বাড়িতে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বারবণিতা (Bargirl) বা দেহব্যাবসায়ী মহিলারা জড় হয়েছিল। মধুচক্রের আসরে বাঈজী মোতির বাড়ি সবসময় সরগরম থাকত। একদিন মোতি বাঈজীর কাণ্ডকারখানা সংবাদ পেয়ে শাহ ইসমাইল শহীদ-এর ফকির সেজে মোতি বাঈজীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। একটি বালিকা বেরিয়ে এল। শাহ সাহেব ফকির হিসেবে পরিচয় দিলে বালিকাটি কিছু পয়সা নিয়ে এলো শাহ সাহেবকে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য। তখন শাহ সাহেব বললেন, "গৃহকর্ত্রীকে খবর দাও, ফকির পয়সা নেবে না – কিছু আওয়াজ শোনাবে।" খবর পেয়ে মোতি বাঈজী শাহ সাহেবকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল। শাহ সাহেব মধুচক্রের আসরে ঢুকে 'সুরা ইয়াসীন' এর তফসীর গাম্ভীর্যপূর্ণ মিষ্টি মধুর ওয়াজ নসীহত শুরু করলেন । শাহ সাহেবের আবেগপূর্ণ নসীহত শুনে বাঈজীখানার পরিবেশ নিমেষে পালটে গেল। বাঈজীখানার আমোদ-প্রমোদ আর হৈ হুল্লোড় ক্রন্দন ও বিলাপ ধ্বনিতে পরিণত হয়ে গেল। বাঈজীরা পবিত্র জীবন যাপনের

অঙ্গীকার নিয়ে তওবা করল এবং বিবাহ করে তারা সত্য সত্যই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল। জীবনে আর কোনদিন ওরা নোংরা পথে অবতরণ করেনি। এটা ছিল শাহ সাহেবের এক আশ্চর্য কারামত।

হজ্ব যাত্রা

আমীরুল মোমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) ইংরেজী ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে হজ্ব সম্পাদন করেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তাই তাঁর উপর হজ্ব ফরজ ছিল না। পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে তৎকালীন যুগের মানুষরা হজ্ব করতে সাহস পেতেন না। তাই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন যুগের আলেম উলামারা হজ্ব ফরজ নয় বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কুরআন শরীফের সুরার বাকারার ১৯৫ নং আয়াত – “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।” আয়াতকে ভিত্তি করে তৎকালীন যুগের আলেম উলামারা এই ফতোয়া দিয়েছিলেন। এই ভুল ফতোয়ার জন্য জেহাদ ঘোষণা করে সৈয়দ আহমদ শহীদ গরীব হওয়া সত্বেও হজ্ব সম্পাদন করেন।

সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ), শাহ ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আব্দুল হাই, শাহ আব্দুল আজীজ ও অন্যান্য হক্কানী উলামারা ফরজ কার্য্য সম্পাদনে কোনরুপ সংকীর্ণতার স্থান বা সুযোগ রাখলেন না। তাঁরা বললেন, ‘ফরয’ ফরযই।

কোলকাতা থেকে যাত্রা শুরু হল। সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) সাড়ে সাত শত মুসলমানের একটা কাফেলা নিয়ে হজ্ব সম্পাদনের জন্য রওনা হলেন। শাহ ইসমাইল শহীদের মাতা ফাতেমাও এই হজ্ব যাত্রাই অংশগ্রহণ করেন। দশখানা জাহাজ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যকটি জাহাজে একটি করে আমীর বা নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই যাত্রাই একটি জাহাজের নেতা ছিলেন শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ)। ১৯২৪ সালে সকলেই হজ্ব ও জিয়ারত সম্পন্ন করে সকলেই দেশে ফিরে আসেন।

হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন ও জেহাদী আন্দোলনের সূচনা

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) হজ্ব যাত্রা সম্পাদন করে দেশে ফেরেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন,

“তাঁর [সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ)] শিক্ষার সঙ্গে বেদুইন মাযহাবের (ওহাবীদের) শিক্ষার সমতা থাকার জন্য মক্কায় থাকাকালে সৈয়দ আহমদ কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। ওই বেদুইন মাযহাবের হাতেই এই পবিত্র শহরটি কিছুকাল আগে এতো দুর্গতি সহ্য করেছিল। এজন্য সেখানকার মুফতী সাহেব প্রকাশ্যে সৈয়দ আহমদকে অপমান করেন ও শহর থেকে বের করে দেন। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, অতঃপর তিনি ভারতে কেবল ধর্মিয়া স্বাপ্নিক ও পৌত্তলিক কুপ্রথাগুলির সংস্কারক হিসাবেই ফিরে এলেন না, তিনি ফিরে এলেন আব্দুল ওহাবের এক গোঁড়া শাগরিদ হিসাবে। তাঁর স্বভাবে যা কিছু স্বপ্নালুতা ছিল তা দূর হয়ে এবার রুপ নিল উগ্র উন্মত্ততার।” (The Indian Musalman)

মি. হান্টার আরো লিখেছেন,

“সৈয়দ আহমদ সাহেব ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাবের একজন নিষ্ঠাবান মুরীদ রুপে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুতরাং যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া আব্দুল ওহাব আরবে একটি বিরাট ওহাবী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সৈয়দ আহমদও অনুরুপ চিন্তায় আত্মহারা হইয়া ভারতের বক্ষ হইতে ক্রুস অঙ্কিত পতাকা উৎপাটিত করিয়া হিন্দুস্থানের প্রতিটি নগর পল্লীতে ইসলামী পতাকা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজ কাফের নিধন যজ্ঞে মাতিয়া উঠিলেন।” (The Indian Musalman, অনুবাদ- মাওলানা আহমদ আলী)

মি. হান্টার সাহেবের মিথ্যা ভাষনে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। Silk Lettrer Movement প্রসঙ্গে ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে ‘মুজাহিদীন’ শব্দের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

“সৈয়দ আহমদ শহীদ আরব সফর করে। সেখানকার কট্টর নজদী ওহাবী আন্দোলনের রঙ তাকে স্পর্শ করে। ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার সে (সৈয়দ আহমদ) হচ্ছে অন্যতম।” ‘মুহাম্মাদ ইসমাইল শহীদ দেহলবী’ নামক টীকায় ব্রিটিশ গোয়েন্দার বক্তব্যঃ “ওহাবী আন্দোলনের কুখ্যাত মৌলবী ইসমাইল দেহলবী, সে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজের বাড়ি থেকে ফেরার হয়েছিল, আর সে মুজাহিদীন বসতি গড়ে তুলেছিল, অত্যন্ত এবং উগ্রপন্থি ছিল।”

এখানে ব্রিটিশ গোয়েন্দা যে মিথ্যা কথা বলছেন তা তার রিপোর্ট দেখেই বোঝা যায়। কেননা সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আর শাহ ইসমাইল ‘শহীদ’ হয়েছেন বালাকোটের যুদ্ধে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ২৬ বছর আগে শাহ ইসমাইল শহীদ হন। সুতরাং শাহ ইসমাইল সিপাহী বিদ্রোহের সময় ‘ফেরার হয়েছেন’ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা রিপোর্ট।

আর অপরদিকে হান্টার সাহেব যে লিখেছেন, “তিনি [সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ)] ফিরে এলেন আব্দুল ওহাবের এক গোঁড়া শাগরিদ হিসাবে” এবং “সৈয়দ আহমদ সাহেব ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাবের একজন নিষ্ঠাবান মুরীদ রুপে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।” সত্যের খাতিরে বলতে হয় হান্টার সাহেবের এই অভিমত সঠিক নয়। কেননা, তথাকথিত ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাব নজদী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। একথা হান্টার সাহেব স্বীকার করেছেন। সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদের হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৫০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান। তাহলে সৈয়দ আহমদ শহীদের সহিত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর যোগাযোগ হল কোথায় যে তিনি ওহাবী নেতার হাতে মুরীদ হবেন? ঐতিহাসিক Philip K. Hitti তাঁর History of the Arabs গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করেছেন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তাহলেও তারিখ হিসাবে দেখা যায় সৈয়দ আহমদের হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৩০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান। সুতরাং হান্টার সাহেবের মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের নিকট সৈয়দ আহমদ শহীদের মুরীদ হওয়ার ঘটনা নিতান্তই জাল ও বানোয়াট। এখন যদি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর কট্টর শিষ্যদের কাছে ওহাবিয়তের পাঠ গ্রহণ করে, সুতরাং উনি শিষ্যের শিষ্য। হান্টার সাহেবের ঐ বক্তব্য থেকে তাও প্রমাণিত হবে না। কারণ তিনিই এক জায়গায় লিখেছেন,

“সর্বশেষ মিশরের মুহাম্মাদ আলী পাশা ওহাবীদেরকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন । ১৮১২ সালে পাশার পুত্রের অধীনস্ত সেনায়ক টমাস কীথ গোলার মুখে মদিনা দখল করলেন । ১৮১৩ সালে মক্কাও ওহাবীদের হস্তচ্যুত হল । আর পাঁচ বছর পরে অলৌকিকভাবে উত্থিত বিরাট শক্তি মরুভূমির বালুর পাহাড়ে বিলীন হয়ে যাবার মত কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল ।” (The Indian Musalman, Page. 52)

এখানে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর হজ্বে যাবার আগেই আরবের ওহাবীরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাই সৈয়দ আহমদ শহীদের ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন কার কাছে? আসলে হান্টার সাহেব সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বক্রোক্তি করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। কথায় বলে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তির ঠিক থাকে না।

মি হান্টার সাহেব তথা ব্রিটিশ লেখকের অনুকরণে ভারতের অধীকাংশ ঐতিহাসিক সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) কে ‘ওহাবী নেতা’ বলেই চিহ্নিত করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে হান্টার সাহেব তথা ইংরেজ লেখকদের সৈয়দ আহমদ শহীদ তথা তাঁর দলবলকে ‘ওহাবী’ রুপে চিহ্নিত করে তাঁদের কি লাভ হয়েছিল? এতে তাঁদের স্বার্থই বা কি ছিল? উত্তর একটাই ইংরেজরা Divide and Rule policy নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই জঘন্য নীতির অনুসরণ করেই ইংরেজরা ভারতে প্রায় দুই শত বছর রাজত্ব করেছে। তখন আরবে নজদী ওহাবী দলের বাড়াবাড়িতে শুধু আরব নয় সমগ্র মুসলিম জাহানও বিক্ষুব্ধ হয়ে উটেছিল। তখন সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁরা অনুসারীরা মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা বানচান করার জন্য মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির দরকার ছিল। তাই মি হান্টার সাহেব তথা ইংরেজরা ভারতীয় মুসলমানদের বোঝাতে লাগলেন, জেহাদীরা আসলে আরবের কুখ্যাত ওহাবী নেতা

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর দল যারা কুরআন ও সুন্নত জীবিত নাম করে হাজার হাজার আলেম-উলামাদের হত্যাকারী ও সাধারন মুসলমান যারা তাদের মাযহাব মানে না তাদের মুশরিক ও কাফের ফতোয়া প্রদানকারী। ওরা মুসলমানদের রক্তে হোলী খেলার দল, যারা রাজ্য লিপ্সায় মত্ত হয়ে মক্কা ও মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষনা করে, যারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পবিত্র হারামাইন শরিফাইন অর্থাৎ মক্কা মদিনা এবং হারাম শরীফের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য আক্রমন করে এবং তাণ্ডবলীলা চালায়। ওরা আওলিয়া এমনকি সাহাবায়ে কেরামদের কবরগুলি পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। মাযহাব মান্যকারী মুসলমান উলামাগণকে হত্যা করে। তাদের মাল আসবাবপত্র লুটতরাজ করে এবং তাদের মাল লুণ্ঠন করাকে হালাল বলে ফতোয়া দেয়। তাই আরবের ওহাবীদের শিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের দলে সামিল হয়ে আন্দোলন করা ভারতীয় মুসলমানদের আদৌ উচিৎ নয়। এই প্রচার কার্যের জন্য ব্রিটিশরা ভারতের কিছু দুর্বলমনা ও দরিদ্র ও স্বার্থপর আলেমকে ব্যাবহার করেছিল। এমনকি সেই দুনিয়ালোভী স্বার্থপর আলেমরা ইংজেরদের প্ররোচনায় সেই জেহাদী আন্দোলনের নেতাদেরকে কাফের বলেও ফতোয়া দেয় যাতে যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে জেহাদী আন্দোলনে শরীক হয়ে ব্রিটিশ বিতাড়নে তৎপর না হয়ে উঠে। জাস্টিস আব্দুল মওদুদ লিখেছেন,

> “জিহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করেছে পাক ভারতীয় মুসলমানদের সাহানাভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধি মূলে। এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে এক শ্রেণীর মোল্লা-মওলবীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করেছিল প্রচারণা কার্যে।” (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় লিখেছেন,

“ ‘ওয়াহাবি’ কথাটি একটি ভূল প্রয়োগ। অনেক মুসলমান এদের অমুসলমান বলে গণ্য করেন। আসলে বৃটিশরাই তাদের দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের ‘ওয়াহাবী’ বলে যেমন তারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলত।” (ভারতের মুক্তি আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা-৪)

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন,

“দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপি এই বৃটিশ বিরোধী জিহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল কজনই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত, কিন্তু এ কথাটি সত্য নয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নাম করণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা ‘ওয়াহাবী আন্দোলন’ বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।” (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১১/১২)

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

“ভারতবর্ষ যে অনুরুপ (ওহাবী আন্দোলন) হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই । ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা – আকাঙ্খা ছিল না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি – সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।” (History of Freedom Movement. iii)

সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী ও তাঁর অনুসারীরা কোনদিনই ওহাবী দলভূক্ত ছিলেন না। আসলে সৈয়দ আহমদ শহীদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কার কার্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী ‘তরিকা-ই-মুহাম্মাদীয়া’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার কার্য। এম. মুনিরুজ্জামান লিখেছেন,

“আরবের আব্দুল ওহাব প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য থাকায় বৃটিশরা এবং এ আন্দোলনের বিরোধীরা এই ‘ওহাবী’ লেবেল এঁটে এ আন্দোলনকে জনসমক্ষে হেয় করতে চেয়েছিলেন।” (উপমহাদেশের মুসলমান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২)

জেহাদী আন্দোলনের তৎপরতা

সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর আন্দোলন প্রথমত সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন ছিল তা কালক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী সমস্ত শিরক বিদআতকে সমূলে উচ্ছেদ করে নিষ্কলুষ সেই ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে যা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামদের জামানায় ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইসলামের মধ্যে অনেক আগাছা প্রবেশ করেছে । সেজন্য তিনি সেই আগাছাকে মুছে ফেলার জন্য সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের সূচনা করেন। এই কাজে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেন তাঁর সুযোগ্য মুরীদ শাহ ইসমাইল শাহীদ দেহলবী (রহঃ)। শাহ ইসমাইল শহীদ ‘তাকবিয়াতুল ঈমান’ কিতাবে শিরক ও বিদআতের মুণ্ডপাত করেন এবং বিদআতী পীর-ফকির-দরবেশদের মুখোশ উন্মোচনা করে ছাড়েন। ফলে বিদআতীরা উক্ত কিতাব লেখার কারণে কাফের ফতোয়া দেয় এবং ‘ওহাবী’ বলে গালিগালাজ করে। এছাড়াও বিদআতীরা শাহ সাহেবকে নবীর গুস্তাখ ফতোয়া দিয়ে থাকে। অথচ শাহ সাহেবের প্রতি এই অপবাদের কোন ভিত্তি নেই। শাহ সাহেব একজন নবীর নিষ্কলুষ প্রেমিক ছিলেন। এই ‘তাকবিয়াতুল ঈমান’ এমন এক কিতাব যা পড়ে তিন লক্ষ হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ)ও উক্ত কিতাব পড়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন। শাহ সাহেব আর একটি কিতাব লেখেন ‘সিরাতে মুস্তাকিম’ নামে । আসলে এই কিতাবটি সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর বাণী সংকলন বা মালফুযাত। এই কিতাবটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যার প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় সংকলন করেছেন শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সংকলন করেছেন আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর জামাতা আব্দুল হাই বুড্ডানবী (রহঃ)।

এইসব কিতাবের দ্বারা সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং তাঁর অনুচরেরা ইসলামের আগাছা পরিস্কার করে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন।

সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি সৈয়দ সাহেব এ দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নে মনোনিবেশ করেন । এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার সাহেব লিখেছেন,

“তিনি (সৈয়দ আহমদ) দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর একজন মশহুর আলেমের (শাহ আব্দুল আজীজের) নিকট শরীয়তি শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে শগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যেসব অনাচার বা বিদআত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রথম কর্মব্যাস্ততা ছিল রোহিলাদের বংশধ্বরদের নিয়ে, যাদের নির্মূল করতে আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বেতনভূক বাহিনী ধার দিয়েছিলাম এবং প্রসঙ্গটা ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবনে একটা অনপেয় কলঙ্ক হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তাদের উত্তর পুরুষেরা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমাদের উপর অশেষ প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং এখনও বিদ্রোহী বসতির সবচেয়ে সাহসী অস্ত্রধারী হচ্ছে তারাই।” (The Indian Musalmans, Page-4)

হান্টার সাহেবের এই স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সৈয়দ আহমদ সাহেব তাঁর পীর শাহ আব্দুল আজীজের নিকট থেকে শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শিক্ষা করেন এবং এর পাশাপাশি ইংরেজ বিরোধীতায় তৎপর হয়ে উঠেন। অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ সাহেব একদিকে শিরক-বিদআত বিরোধী ও ইংরেজ বিদ্বেষী দুটোই।

হান্টার সাহেব আরও লিখেছেন,

“বিশেষতঃ ইমাম সাহেব ১৮২০-২২ সালে কোলকাতা যাওয়ার পথে গঙ্গানদীর উপত্যকায় অবস্থিত যে সব বড় শহরে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন, সে সব শহরে টাকা পয়সা সংগ্রহ করতে লাগল। এভাবে আমাদের রাজ্য থেকে অজস্র ধারায় অসন্তুষ্টের দল জিহাদী বসতিতে জামায়েত হতে লাগল।” (The Indian Musalmans, Page-13)

হান্টার সাহেবের এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে সৈয়দ আহমদ সাহেব অনেক আগে থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে আসছেন। তিনি কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী বলেই হান্টার সাহেব সৈয়দ আহমদ সাহেবকে গালিগালাজ দিয়েছেন এবং দস্যু দরবেশ বলে ব্যাঙ্গ করেছেন।

মাওলানা গোলাম রাসুল মিহর লিখেছেন,

“সৈয়দ সাহেব ও অন্যান্য মুসলমান শাসক ব্যাতিত শাহ মাহমুদ (হিরাতের শাসক)কেও দিয়েছিলেন জিহাদের দাওয়াত। তাতে বলা হয়, জিহাদ কায়েম করা এবং বিদ্রোহ ও গোলযোগ দুরীভূত করা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে আল্লাহ তা’লার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হুকুম বলে গণ্য করা হয়েছে। বিশেষ করে সেই যামানায় তা আরো সত্য, যখন কাফির ও দুস্কৃতিকারীদের অনিষ্ট এমন রুপ পরিগ্রহ করে যাতে, উদ্ধত ও বিদ্রোহীদের হাতে দ্বীনি কার্যকলাপ বিকৃত হয়ে যেতে থাকে, ইসলামী রাজা – বাদশাহদের শাসনাধীন এলাকাসমূহ পতনের দিকে নেমে যেতে থাকে এবং এই গুরুতর অনিষ্ট ভারত (হিন্দ), সিন্ধু ও খোরাসানের ভূখণ্ড সমূহে প্রসার লাভ করেছে। এহেন অবস্থায় উদ্ধত কাফিরদের অনিষ্ট উপেক্ষা করা এবং অনিষ্টকারী বিদ্রোহীদের কানমলা সহ্য করে যাওয়া কঠিন ও গুরুতর গুনাহ। এরই জন্য খোদার দরগাহ এ বান্দা স্বদেশ পরিত্যাগ করে হিন্দ, সিন্ধু ও খোরাসান সফর করেছে এবং তথাকার মুমিন ও মুসলমানদেরকে জিহাদের আমন্ত্রন জানিয়েছে।

গোয়ালিয়রের হিন্দুরাওকে তিনি এক পত্রে বলেন, ‘যে বিদেশীরা বহু দূর থেকে আগত, তারা এখানে রাজত্ব কায়েম করেছে। যে বনিকরা পণ্য বিক্রয় করতো, তারা কায়েম করেছে সালতানাত (রাজত্ব)। বড় বড় আমীরদের ইমারত এবং রইসদের রিয়াসত মাটিতে মিশে গেছে। যারা ছিল রিয়াসত এবং সিয়াসত (রাজনীতি)র মালিক, তারা আজ অখ্যাত অবজ্ঞাত হয়ে কোন স্থানে আত্মগোপন করেছে । অবশেষে ফকির ও মিসকিনদের ভিতর থেকে স্বল্প সংখ্যক লোক সাহসে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। দুর্বল মানষদের এই দলটি কেবল খোদার দ্বীনের খিদমতের লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দুনিয়াদার বা পদমর্যাদার দাবীদার নয়। হিন্দুস্থানের ময়দান যখন বিদেশী ও দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত হবে এবং এই দুর্বলদের প্রচেষ্টার তীর লক্ষ্যভেদ করবে, তখন ভবিষ্যতের জন্য রিয়াসত এবং সিয়াসতের ভার যোগ্য লোকেদের অপরই অর্পিত হবে।

ভেবে দেখুন, যে দূরাগত বিদেশী ব্যাবসায় করতে এসে সালতানাতের (রাজত্বের) মালিক হয়ে বসেছিল, তারা কারা? স্পষ্টতই তারা ছিল ইংরেজ এবং তাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সৈয়দ সাহেব নিজে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছিলেন।

শাহজাদা কামরানকে সৈয়দ সাহেব যে পত্র লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষঃ- ‘সবাইকে আমি জিহাদের দাওয়াত জানিয়েছি। আমার ইউসুফ যাই এলাকায় অবস্থানকালে আফরিদী খটক, মোহমন্দ, খলীল উপজাতি, নংগরহাব, সোয়াত, বুনির ও পাখালির বাসিন্দারা

এবং কাশ্মির প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ আমার সহচার্যে আসে। আমার উদ্দেশ্য হুকুমত নয়, আমার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর বাণীকে উচ্চ মর্যাদা দান ও সুন্নত নববীর পুনরুজ্জীবন। এছাড়া আমি চাই ইসলামী এলাকা সমূহের দুষ্কৃতিকারী কাফেরদের হাত থেকে মুক্তিবিধান। যখন সে এলাকা মুশরিক ও মুনাফিকদের অধিকার – মুক্ত হবে, তখন তা যোগ্য লোদের হস্তে ন্যস্ত করা হবে। …… তারপর আমি মুজাহিদদের সাহায্যে হিন্দুস্তানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করব, যাতে সেখানে কাফির ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের খতম করে দেওয়া যায়। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানে জিহাদ, খোরাসানে বসতি স্থাপন নয়।

সৈয়দ আহমদ শহীদের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমি ব্যাখ্যা করেছি, সে সম্পর্কে এর চাইতে স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর প্রমাণ আর কি হতে পারে?” (মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২/৫)

এখানে মাওলানা গোলাম রাসুল মিহর সাহেবের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে সৈয়দ আহমদ শহীদের মূল আন্দোলন ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া লিখেছেন,

“সৈয়দ সাহেবের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ভারত থেকে ইংরেজদের আধিপত্য উচ্ছেদসাধন, যার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েই উদ্বিগ্ন ছিল, তাই তিনি হিন্দুদেরকেও আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, তাঁর একক উদ্দেশ্য দেশ থেকে বিদেশীদের প্রভাব খতম করা। এরপর হুকুমাত কাদের হবে, সে ব্যাপারে তাঁর মাথাব্যাথা নেই, হিন্দু মুসলমান বা উভয়েই, যারা যোগ্য বিবেচিত হবে দেশ শাসন করবে।” (শানদার মাযি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৩/১৯৫)

সৈয়দ আহমদ চেয়েছিলেন তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পাঞ্জাবের শাসক রঞ্জিত সিংহ সহযোগিতা করে। কিন্তু রঞ্জিত সিং তা না করে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শুধু তাই নয় রঞ্জিত সিং সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং মুসলমানদের জান মালের শত্রু হয়ে যান । সৈয়দ আহমদ সাহেব একবার সীমান্তের পঞ্জতরে উলামা ও পাঠানদের সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলেন,

“আমি খেয়াল করেছিলুম, হিন্দুস্তানে কোন নিরাপদ স্থানে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করব। কিন্তু বিরাট এই দেশে আমি কোন উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেলুম না। কত লোক প্রস্তাব দিয়েছে, এই দেশে জিহাদ করো। কিন্তু আমার মনঃপুত হয়নি। কেননা জিহাদ সুন্নত অনুসারে হওয়া চাই, অহেতুক হাঙ্গামা বাধানো উচিত নয়। তোমাদের দেশী ভাই উপস্থিত ছিল। ওরা প্রস্তাব দিল, ‘আমাদের দেশ এদিক দিয়ে খুবই উপযুক্ত। আপনি ঐখানে গিয়ে কোথাও কেন্দ্র গড়ে তুলুন; লক্ষাধিক মুসলমান জান – মাল দিয়ে আপনার সাহায্য করবে। বিশেষতঃ লাহোরের শাসনকর্তা রঞ্জিত সিংহ মুসলিমদেরকে অতিষ্ঠ করছে, কষ্ট দিচ্ছে, বেইজ্জত করছে। ওদের সেনাবাহিনী মসজিদে অগ্নিসংযোগ করছে, ফসল নষ্ট করছে। মাল – সামান ওরা লুটপাট করছে। নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে ওদের দেশ পাঞ্জাবে বেচে দিচ্ছে। মসজিদে আজানের অনুমতি নেই, মসজিদে ঘোড়া বাঁধছে। গরু জবেহ তো দুরের কথা, গরু জবেহর নাম শুনলে মুসলিমদের মেরে ফেলছে। আমি এসব কথা শুনে ভাবলুম, ওরা ঠিক বলছে। ভারত থেকে হিজরত করে ঐ দেশে অবস্থান করব, বেদ্বীনদের সঙ্গে জিহাদ করে যুলম – অত্যাচারের অবসান ঘটাব।” (সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৬/৪২৭)

সৈয়দ আহমদের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে তিনি সাময়িকভাবে ব্রিটিশ বিরোধীতার মোড় পাঞ্জাবের শিখ নেতা রঞ্জিত সিংহের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন প্রথমে রঞ্জিত সিংহের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের নিস্কৃতি দেওয়া যাক তারপর ব্রিটিশদের উৎখাত করার তৎপরতা গ্রহণ করা যাবে।

বালাকোটের সেই মর্মান্তিক মুহুর্ত

শিখ ও মুসলিম সংঘর্ষ সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেছেন,

“পাঠান আদি জাতিরা উন্মত্ত আবেগে তাঁর (সৈয়দ আহমদ শহীদ) আহ্বানে সাড়া দিল। এই হাঙ্গামাপ্রিয় অতি সংস্কারাপন্ন মুসলমানরা বড় খুশি হলো এই ভেবে যে, দ্বীনের নামে হিন্দু (শিখ) প্রতিবেশীদেরকে লুন্ঠন করার একটা সুযোগ মিলে গেল। আধুনিক হিন্দু জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় আক্রমণ প্রবল শিখরা তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। ইমাম সাহেব (সৈয়দ আহমদ শহীদ) তাঁর ধর্মান্ধ সীমান্তবাসী মুসলমানদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জিহাদে যারা জয়ী হয়ে ফিরে আসবে, তারা বেশুমার মাল-ই-গনিমত আনবে, আর যারা নিহত হবে, তারা শহীহী মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেহেশতে উপস্থিত হবে। তিনি কান্দাহার ও কাবুলের মধ্য দিয়ে সফর করে আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং আদি জাতি গুলিকে কৌশলে এক জোট করে শক্তিকে সুদৃঢ় করলেন।”

“১৮২৭ সালে ইমাম সাহেব (সৈয়দ আহমদ শহীদ) শিখদের এক গড়বন্দী ছাউনির বিরুদ্ধে নিজের অনুচরদের চালনা করেন। কিন্তু বহু প্রাণক্ষয় স্বীকার করে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। সমতলভূমির শিখ জেনারেল অবশ্য তাঁদের তাড়া করে সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সাহসী হননি। মুজাহিদ সৈন্যরা সিন্ধুনদ পার হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিল এবং গেরিলা যুদ্ধে যেরকম সাফল্য দেখাল যে, শিখনায়ক অনন্যোপায় হয়ে যারা লুন্ঠনকার্য্যে বেশী তৎপরতা দেখিয়েছিল, সেই আদি জাতির মিত্রতা ক্রয় করতে বাধ্য হলেন। ১৮২৯ সালে সমতলবাসীরা তাদের সীমান্তের রাজধানী পেশোয়ারের নিরাপত্তার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো এবং তাদের শাসক হীন ষড়যন্ত্রে ইমাম সাহেবকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান করতে চাইলো। এই গুজব ছড়িয়ে পড়া মাত্র পার্বত্য অঞ্চলের মুসলমানদের জিদ আগুনের মত জ্বলে উঠল। তারা সমতলভূমিতে ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে এসে শিখ সৈন্যদের একজোগে হত্যা করলো এবং তাদের জেলারেলকেও মারাত্মকভাবে জখম করলো। এরপর যুবরাজ শেরসিংহ এবং তাদের জেনারেল ভেনতুরা বিশাল বাহিনী নিয়ে কোন রকমে পেশোয়ার রক্ষা করেন।”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে পেশোয়ারের পতন হয়। হান্টার সাহেব লিখেছেন,

“অনন্যোপায় হয়ে শিখনেতা রঞ্জিত সিং খুব সুদক্ষ সেনানায়কদের অধীন এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার (জেনারেল আলার্ড ও হরিসিং নালওয়ার অধীনস্থ শিখ বাহিনীর নিকট) পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে। আর সেই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তাদের হস্তগত হয়। এই হলো ইমাম সাহেবের কর্মজীবনের চরমোন্নতির মুহূর্ত। তিনি নিজেকে খলিফা হিসাবে প্রচার করলেন এবং ‘সত্যাশ্রয়ী আহমদ, দ্বীনের রক্ষক, তার ঝকঝকে তরবারি কাফেরকূলের নাশ করে’ এই বাণী নিয়ে নিজ নামে তঙ্কা জারি করলেন। কিন্তু পেশোয়ারের পতনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো, তার দরুন রঞ্জিত সিংহও তাঁর অতুলনীয় কূটনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এই অতি চতুর শিখ নায়ক অতঃপর ছোট ছোট মুসলমান আমীরকে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ফলে ইমাম সাহেব মুক্তি মূল্য দিয়ে শহরটি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । অন্তর্বিরোধের দরুন, তাঁর অনুগামীদের উপর কর্তৃত্বও শিথিল হয়ে গেল।” (The Indian Musalmans, Page-6/9)

কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার সফলতা পেলেও সৈয়দ আহমদ শহীদ ৫ই মে এবং তাঁর শিষ্য শাহ ইসমাইল শহীদ ৯ই মে শহীদ হন। সৈয়দ আহমদের মস্তক দেহ থেকে খণ্ডিত করা হয়। প্রায় সাড়ে চার শত সৈন্য এই যুদ্ধে শহীদ হন। যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা বেলায়ত আলী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী প্রমুখ।

এখানে শাহ ইসমাইল শহীদের ব্যাপারে একটি অলৌকিক ঘটনা উল্লিখিত আছে। শাহ ইসমাইল শহীদের কাছে একবার এক শত্রু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিন্দা করলে শাহ ইসমাইল শপথ করে বলেন ওকে নিহত না করা পর্যন্ত আমি কখনো মরবো না। আশ্চর্য্যের বিষয় ভীষন যুদ্ধের সময় শত্রুটি শাহ ইসমাইলের উপর আঘাত হানল। শাহ ইসমাইল মস্তক কর্তিক অবস্থায় হাত ধৃত

তরবারি চালিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে শত্রুকে নিহত করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা-১০৮, আজিবুল হক)

শহীদ হওয়ার পর সৈয়দ আহমদ শহীদের লাশ আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে এ কথা সত্য যে তিনি দেশবাসীকে রক্তমাখা মাথা উপহার দিয়ে গেছেন যা থেকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তাঁর অগ্নিমন্ত্রে অদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

আন্দোলনের পর্যালোচনা

সৈয়দ আহমদ শহীদের এই আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আন্দোলন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

"Its may be called first war of Indipendence in India." (History of freedom Movement, R.C. Majumder)

রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও লিখেছেন,

"ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা-আকাঙ্খা ছিল না তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসেবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" (আব্দুল মওদুদঃ ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

হান্টার সাহেবও সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন,

> *"The Mussalmans of India are and have been for many years a source of chronic to the British power of India."* (The Indian musalman)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় তাঁর Freedom Movement and Indian Muslim গ্রন্থে এই আন্দোলনকে "Most remarkable anti-British of 19th century panic of British, chief headache of British antherities" প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন,

"শিখরা যদিও স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করে তবু তাদের স্বাভাবিক স্থান হিন্দু মেজাজেরই উদার পরিসরে এবং হিন্দু ধর্মের অঙ্গ স্বরুপ হয়েও শিখ সম্প্রদায়ের অন্তঃস্থলে সংগ্রামী মনোভাবের প্রকটতা লক্ষ্যণীয়। আর এই মনোভাবের দরুনই সংগ্রামী মুসলিমদের সঙ্গে শিখদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল সংগত আর্থাৎ এখানেই ওয়াহাবীরা পেয়েছে নির্বিরোধ তথা নিরস্ত্র হিন্দুদের বাদ দিয়ে সশস্ত্র শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার যৌক্তিকতা। সে যুদ্ধে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতেই অবসিত হয়নি, আহমদের পরে পাটনার খলিফাময় বলে পরিচিত ওয়ালিয়াৎ আলী ও ইনায়াত আলীর নেতৃত্বে ওয়াহাবীরা একযোগে ব্রিটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং মিত্তানাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। ....ওয়াহাবী তৎপরতার প্রেরণাতেই বিহারে অল-ই-হাদিস এবং বাংলায় ফরাজী আন্দোলন গড়ে উঠে এবং যেটা লক্ষ্যণীয় সেইটি এই যে, দুটির কোনটিই দৃঢ় অর্থে হিন্দু – বিরোধী আন্দোলন ছিল না, দুটিই ছিল মুসলিম নেতৃত্বে চালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।" (ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা-১৪৯)

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন,

“ওহাবী বিদ্রোহ মূলত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। এই বিদ্রোহ ছিল ভারতের বৈদেশিক শাসনের (ব্রিটিশ) উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীর বিদ্রোহ। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যানেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মাধ্য দিয়ে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য যে স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে জ্বলন্ত প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মুক্ত কন্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।” (মুক্তির সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃষ্ঠা-৯৯)

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে তাঁর ‘বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন,

“ওয়াহাবীরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকাল ব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওয়াহাবী আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায়।”

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন,

“ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিশ্বাসীর চোখে দেখিত না। রাজত্ব হারাইয়া মুসলমানগণই প্রথম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ওহাবী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য এবং প্রসঙ্গত এখানে বলা যাইতে পারে যে মুসলিমদের আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে যে জাতিয় চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহাকে অবলুপ্ত করিবার জন্যই ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মতো একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি।” (পনেরই আগস্ট, পৃষ্ঠা-১০২)

অধ্যাপক পভাতাংশু মাইতি সৈয়দ আহমদের এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন,

“ইংরাজ বা বিদেশীদের বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে দারুল ইসলামে পরিণত করার আহ্বান তিনি দেন। তিনি বলেন যে, বণিক ইংরেজরা ভারতের সম্পদ শোষণ করে দেশকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। এদের বিতাড়িত না করলে ভারতবাসীর রক্ষা নেই।” (আধুনিক ভারত ১৫শ সং, পৃষ্ঠা – ১০৪)

ঐতিহাসিক ডাঃ কল্যান চৌধুরী লিখেছেন,

“ঐ সময় মুজাহিদীন বা তরিকাই-মুহাম্মদীয়া নামে ধর্মযোদ্ধারা ধর্ম ও রাজনীতিকে একত্রিত করে বিদেশী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।” (আধুনিক ভারতের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা – ৯৬/৯৭)

ঐতিহাসিক অতুল রায় লিখেছেন,

“তিনি (সৈয়দ আহমদ) সাহায্যের জন্য মারাঠা – অধিনায়ক রাজা হিন্দুরাও এর কাছে পত্র লেখেন। সৈয়দ আহমদ উত্তর – পশ্চিম সীমান্তে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করলে প্রতিবেশী পাঞ্জাবের শিখরাজ্যের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটে।” (ভারতের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা – ২৬৫)

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলাম লিখেছেন,

সৈয়দ আহমদ শহীদের এই আন্দোলন কালক্রমে গণ-আন্দোলনের রুপ নিয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ধর্মের সাথে জড়িত থাকায় তৎকালীন শাসক ও জমিদার গোষ্ঠী খুব সহজেই সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিকে প্রধান করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মের সাথে জড়িত থাকলেও এই আন্দোলন ক্রমশঃ গণবিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। আমিনুল ইসলামের কথায়, "সৈয়দ আহমদের দূরদর্শীনীতির ফলে এই মতবাদ কেবলমাত্র তত্ত্বের নীরস কচকচানির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের সাথে সাথে ওয়াহাবী আন্দোলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রুপ নিল।...... অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিদ্রোহ কেবল মুসলিমদের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এ ভাবে বিভিন্ন তথ্য হতে দেখা যায়, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রথমে ধর্মের নামে শুরু হলেও এটা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং জমিদার – নীলকর – মহাজন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।" (বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান চর্চা, পৃষ্ঠা-৯২/৯৩)

অনেকে এই আন্দোলনকে হিন্দুবিরোধী বললেই এই আন্দোলন কোনদিন হিন্দুবিরোধী ছিল না। কারণ বহু হিন্দু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সূত্র অনুযায়ী জানা যায় যে,

এই আন্দোলনের (ওহাবী) সমর্থন করার জন্য বহু হিন্দুকে আটক করা হয়েছিল। বহু হিন্দু এই আন্দোলনে সংগ্রামী তহবিলে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাই এই আন্দোলন কোনদিন হিন্দুবিরোধী ছিল না এবং এই আন্দোলনের মুজাহিদরা হিন্দুদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়নি। এই আন্দোলনের হিন্দু-মুসলমানের সক্রিয় সমর্থন ছিল বলেই মুজাহিদরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালাতে পেরেছিল। অমলেন্দু দে লিখেছেন, "এমন দক্ষতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় যে, ... কোথাও ওহাবীদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়নি। হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁদের সাহানুভূতি প্রদর্শন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই কারণে এই আন্দোলনের সময় কিছু সংখ্যক হিন্দুকে গ্রেফতার করা হয়। যদি ফরাজী – ওয়াহাবী আন্দোলনের চরিত্র প্রকটভাবে সাম্প্রদায়িক হত তাহলে দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের উত্তর – পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী করিডর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না, আর নীল বিদ্রোহের সময়ে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান কৃষকদের অভূতপূর্ব ঐক্য গ্রাম বাংলায় সম্ভবপর হত না। শ্রেণী নির্বিশেষে মুসলমান সমাজের সাহানুভূতি যেমন এই ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতি ছিল তেমনি হিন্দুরাও সম্প্রদায়গতভাবে অংশগ্রহণ না করলেও এই আন্দোলনকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে সক্রিয়ভাবে বিরোধীতা করতে অগ্রসর হয়নি।" (বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৯৪)

বহু সংখ্যক মুসলমান ও কিছু সংখ্যক হিন্দু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনীরা পরাস্ত হয় । কারণ বহু সংখ্যক মুসলমান এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও অনেক মুসলমান এমন ছিল যারা এই আন্দোলনের সমর্থক ছিল না। কেননা এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সমাজ সংস্কারক হিসাবে। এই আন্দোলনের কর্ণধাররা চেয়েছিলেন দেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের পাশাপাশি মুসলিম সমাজে যে অনাচার (শিরক-বিদআত) প্রবেশ করেছে তা দূর করতে। কিন্তু সমাজের অনাচার ও শিরক বিদআতে আচ্ছন্ন গোষ্ঠীরা কোনদিনই চাননি সমাজ সংস্কার হোক এবং মুসলিম সমাজ শিরক-বিদআতের অন্ধকার থেকে ফিরে আসুক। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কবরপুজারী সম্প্রদায়। তারা চেয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে সমাজে যে অনাচার চলছে তা চলুক। তাদের কবরপুজার লাভজনক ব্যাবসা যাতে বন্ধ না হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এই আন্দোলনের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা শুরু করে দেন এবং শাহ ইসমাইল শহীদের লেখা 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কে কেন্দ্র করে সমাজে বিশৃঙ্খলা শুরু করে দেয়। শাহ ইসমাইল শহীদকে তারা নবীর গুস্তাখ ফতোয়া দিয়ে শাহ সাহেবের নামে বিভিন্ন অপপ্রচার শুরু করে। এমনকি তারা শাহ সাহেবকে কাফের বলেও ফতোয়া দেয়। ফলে বহু সংখ্যক মুসলমান কবরপুজারী ভণ্ডদের প্রতারণায় ফেঁসে গিয়ে এই আন্দোলনে শরিক হয়নি।

অপরদিকে সীমান্ত সংগ্রামে এই আন্দোলনের ব্যার্থতার কারণ হিসাবে বলা যায় উপজাতিদের মধ্যে আত্মকলহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা। সীমান্ত এলাকায় অধিবাসীরা সাধারণত স্বাধীনচেতা ও রণপটু। সৈয়দ আহমদ অনেক বিবেচনার পর সংগ্রামের কেন্দ্রকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যাশা ফলপ্রসু হয়নি।

এই সংগ্রামের ক্ষেত্র নির্বাচিত হয়েছিল দেশের বাইরে। তাই দেশের অভ্যন্তরে সেনা ও রসদ থাকার জন্য এই আন্দোলনের বিপর্যয় হয়েছিল।

এই আন্দোলনের বিপর্যয়ে সব থেকে বড় কারণ ছিল উন্নত সমরাস্ত্রের অভাব। এই আন্দোলনের মুজাহিদদের যে অস্ত্র ছিল তা গাদা বন্দুক আর বাঁশের লাঠি । কিন্তু ব্রিটিশদের হাতে ছিল এনফিল্ড রাইফেল। মুজাহিদরা এই গুরুতর সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই অধ্যাপক কায়েমুদ্দিন আহমদ দুঃখ করে লিখেছেন,

> “The tragedy of the situation lay in the fact that the significance of this crucial factor, demonstrated again and again from the 18th century on words, was never fully realized either by the leaders of the Movement of 1857 or by the Wahabis. When the significance of a factior itself is not realised the question of taking remedial measures against it, naturally, does not arise. (Page-342)

এই আন্দোলনের বিপর্যয়ের আর একটি বড় কারণ ছিল অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের উদাসীনতা। হিন্দুরা মোঘল যুগে যেমন আরবী, ফারসী ভাষা রপ্ত করে পায়জামা, সেরওয়ানী পরে মুসলমান শাসনকালে মুসলমানদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছিলেন অনুরুপ ব্রিটিশ শাসনকালে তাঁরা ইংরেজী ভাষা আয়ত্ব করে কোট-পেন্টালুন ধরতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁরা ঠিক সময়ের সাথে নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেক হিন্দুই চেয়েছিলেন মুসলমানদের পরিবর্তে ব্রিটিশরাই রাজা হোক এবং তাঁরা ব্রিটিশের জয়গান গেয়েছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

> “ইংরাজী রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে ও নিষ্কন্টক ধর্মাচরণ করিবে।”

তিনি আরও লিখেন,

> “মুসলমানদের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল । হিন্দু সিপাহী ইংরাজের হইয়া লড়িল । হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই; আজিও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে (হিন্দু) অত্যন্ত প্রভূভক্ত।”

বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন,

> “স্বাধীনতা স্বদেশী কথা নহে; বিলাতী আমদানি, ‘লিবার্টি’ শব্দের অনুবাদ,…ইহার এমন তাৎপর্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে।”

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতির মনের কথা অন্যত্র লিখেছেন,

“অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? যাঁহারা এইরুপ বলিবেন তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি, অনেককাল পরাধীন থাকিব – সে মীমাংসা আমাদের প্রয়োজন নাই।” (ভারত কলঙ্ক – ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা)

বঙ্কিমচন্দের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় হিন্দুরা মুসলমান শাসনকাল থেকেই নিজেদের পরাধীন বলে মনে করতেন এবং পরাধীনতাকে তাঁরা স্বাচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাই শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অযথা হাঙ্গামা করে নিজেদের উপর অনাকাঙ্খিত বিপদ টেনে আনতে চান নি। তাই তাঁরা প্রথম দিকে স্বাধীনতার আন্দোলনে তেমন কোন আগ্রহ তো দেখান নি বরং ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন।

হান্টার সাহেব লিখেছেন,

“ভারতীয় মুসলমানেরা হচ্ছে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির জন্য চিরন্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসন প্রণালী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শিষ্ট ভাবাপন্ন হিন্দুরা যেখানে আমাদের প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে, সেখানে মুসলমানেরা যেগুলিকে তাদের ভীষন অবিচার হিসেবেই ধরে নিয়েছে।” (Indian Musalman, Page – 3)

হিন্দুরা ব্রিটিশদের রাজত্বকে রামরাজ্য বলে মনে করতেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,

> চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়
>
> ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয় ।।
>
> এমন সুখের রাজ্য আর নাহি হয়
>
> শাস্ত্রমতে এই রাজ্য রামরাজ্য কয় ।।
>
> ---
>
> ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয় ।
>
> মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় ।।
>
> ---
>
> জয় হোক ব্রিটিশের, ব্রিটিশের জয় ।

> রাজ অনুগত যারা, তাদের কি ভয় !”
>
> (দিল্লীর যুদ্ধ, গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা – ১৯১/৩২০)

তিনি আরও লিখেছেন,

> “যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস
>
> সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা”
>
> “গরু জরু (স্ত্রী) লবে কেড়ে চাঁপদেড়ে যত নেড়ে
>
> এইবেলা সামাল সামাল ।”

তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তিভরে লিখেছেন,

> “এই ভারত কিসে রক্ষা হবে
>
> ভেব না মা সে ভাবনা ।
>
> সেই তাঁতিয়া টোপির মাথা কেটে
>
> আমরা ধরে দেব ‘নানা’ ।”
>
> (কানপুরের যুদ্ধ, পৃষ্ঠা – ১৯০)

তাহলে বুঝাই যাছে যে হিন্দুরা পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য তাঁরা সৈয়দ আহমদের বাহিনীকে সমর্থন করতে পারেন নি । এটা সৈয়দ আহদের আন্দোলনের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা যায়।

শিখরাও সৈয়দ আহমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ মিঁয়া (রহঃ) লিখেছেন,

“কতই না ভাল হত, যদি শিখ ইংরেজের স্বরুপ উপলব্ধি করত এবং সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে নিজ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হত! কিন্তু ওঁরা সৈয়দ সাহেবের পতন ঘটিয়ে ১০/১৫ বছরের মধ্যে শিখ হুকুমতেরই মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল।” (শানদার মাযি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৯)

তবে এই আন্দোলন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মুজাহিদ বাহনী পরাস্ত হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অগ্নিযুগের বিপ্লবী-মুজাহিদরা অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইলের বীরত্ব দেখেই প্রেরণা লাভ করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েগিয়েছিলেন। যার ফলাফল হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।

বালাকোটের পরবর্তী পর্যায়

সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ বালাকোটের প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পর তাঁর অনুসারীরা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ইনায়েত আলী ছিলেন বাংলাদেশে ও বিলায়েত আলী ছিলেন দাক্ষিণাত্য।

সৈয়দ আহমদের খলিফারা বালাকোটের লুন্ঠিত পতাকাকে আবার উচ্চে তুলে ধরেন এবং মুজাহিদ বাহিনীরা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়েন। পাটনাতেও সৈয়দ সাহেবের খলিফারা নতুন উদ্যম নিয়ে এই আন্দোলনের তৎপরতা শুরু করেন। এই উদ্যমকে হান্টার সাহেব প্রশংসা করে লিখেছেন,

> *"Again the fanatic cause seemed ruined. But the Missionary zeal of the Patna caliphs and the immense pecuniary resources at their command once more raised the sacred banner from the dust. They covered India with their emissaries and brought about one of the greatest religious revivals that has ever taken place."* (Wahabism in India, Calcutta C.C.I & C II সংখ্যা, 1870)

এইভাবে এই আন্দোলনের গতি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই আন্দোলনের ধারা সারা ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হান্টার সাহেব লিখেছেন,

"তাহারা এরুপ নিপুণতা সহকারে এবং সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন যে যে সমস্ত লোক একবার তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা জেহাদে যোগদানপূর্বক প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য পাগলপারা হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে প্রতি জেলার জন্য এক একজন করিয়া দায়িত্বপূর্ণ প্রচারক নিযুক্ত ছিল। এবং তাহারা জনসাধারণের মধ্য দিয়া ধর্মোন্মাদনা জাগাইয়া জেহাদে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত। এই সকল প্রচারক আপনাপন জীবনের সুখ আরামের কথা বিস্মৃত হইয়া স্বার্থলেশশূন্য অবস্থায় বিরামহীন গতিতে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনায় কেন্দ্রীয় প্রচার সমিতি হইতে তাঁহাদিগকে সর্বদা সর্বপ্রকারে সাহয্য ও উপদেশ যোগান হইতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীগণ বাংলায় কিরুপ বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করিয়াছিল সে কথা লইয়া পরে আলোচনা করিব। এই জেহাদী প্রচারকবৃন্দ দক্ষিণ ভারতে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ফলে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকগণও জেহাদের ব্যয় নির্বাহার্থ আপনাপন অঙ্গ হইতে হীরা জওহর জড়িত মূল্যবান গহনা খুলিয়া দিবার জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে তাহারা অসংখ্য রংরুট সংগ্রহ করিয়া মুজাহিদ ক্যাম্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা প্রতিটি মুসলমান অধ্যুষিত স্থানে উপনীত হইয়া আপামর জনসাধারণকে জেহাদের নামে উন্মত্ত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যদিও বাঙালী মুসলমানের অফুরন্ত সাহয্য ও অসীম ত্যাগ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। তবুও অন্যান্য প্রদেশবাসী মুসলমানগণও অনেকদিন পর্যন্ত একইভাবে আন্দোলনকে শক্তি জোগাইয়াছে। পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন যে, 'এই সমস্ত প্রচারকবৃন্দ আমাদের জেলাসমূহের ঘন বসতি সমন্বিত শহর ও গ্রামসমূহে গিয়া সরকারী কর্মচারীদের চোখের উপর বিদ্রোহের বিষ ছড়াইয়া এই প্রকার ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে (১৮৬৫ সালের পাটনার সরকারী দস্তাবেজ)।" (The Indian Musalmans)